আমি হতে চাই সিরিজ ■ ১

# আমি সত্যবাদী হতে চাই

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান

# আমি সত্যবাদী হতে চাই

## এক

টিনের চালে রিমঝিম শব্দে একটানা বৃষ্টি পড়ছে। সেই শব্দের সাথে ভেসে আসছে সুমধুর ধ্বনি, 'হাইয়া আলাল ফালা'। ক্ষীণ কিন্তু মধুর; রহমতের বৃষ্টির সাথে আজানের সুর যেন হৃদয়ে শিহরন তুলে যাচ্ছে। নকিব কান পেতে শুনছে এই মধুর সুর। হঠাৎ একরাশ সজীব বাতাস ঘুলঘুলি দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। এলোমেলো করে দিয়ে গেল তার চুলগুলোকে। নাকে এসে ছোঁয়া দিয়ে গেল বাইরের সোঁদা মাটির গন্ধ। সামনের উঠোনের কদম গাছের ফুলগুলো সদ্য রেণু মেলে দিয়েছে। তার সৌরভে ছেয়ে গেছে চারপাশ। কী মিষ্টি সেই ঘ্রাণ!

বর্ষাকালের প্রথম বৃষ্টি। মিষ্টি বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিল নকিব। চোখ বন্ধ করে বলল—'আল্লাহুম্মা সাইয়েবান নাফিয়ান; হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি দাও।'

এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির ধ্বনি শুনছিল সে। মায়ের ডাকে ঝটপট উঠে বসল।

মা এবার আনাসকে ডাকতে শুরু করল। ঘুম ঘুম চোখে আনাস বলল–'আম্মু, আমার না পেট ব্যথা করছে। আজকে বাসাতেই নামাজ পড়ি না! প্লিজ আম্মু, প্লিজ!'

এরপর সে মুখ বাঁকিয়ে পেটে বালিশ রেখে 'কু কু' আওয়াজ করতে লাগল।

নকিব ছোটো ভাইয়ের মুখ দেখেই বুঝল, সে পেট ব্যথার অভিনয় করছে। প্রতিদিন ভোরে আনাস কোনো না কোনো বাহানা বের করে। কোনো দিন মাথায় হাত দিয়ে 'উহ আহ' করে ব্যথা, কোনো দিন পেটে বালিশ চেপে 'কু কু' শব্দ করে ব্যথা,

কোনো দিন হাত দিয়ে পা টিপতে টিপতে 'আউ আউ' শব্দ করে ব্যথা। এত ব্যথার অভিনয় যে সে কীভাবে করে, তা নকিবের মাথায় আসে না।

নকিব ধমক দিয়ে বলল–'কালকে তোর পা ব্যথা ছিল, আজকে আবার পেট ব্যথা! প্রতিদিন এত ব্যথা কই পাস তুই?'

আনাস 'কু কু' শব্দ করে পেটে চাপানো বালিশসহ ওপাশে ফিরল।

মা আনাসের পাশে বসলেন। গায়ে হাত রেখে বললেন–'জলদি ওঠ! এত বাহানা দেখাতে হবে না। তোর এসব মিথ্যা অভিনয় আমি বুঝি। নামাজের জামাত শুরু হয়ে যাচ্ছে, এবার ঝটপট ওঠে পড়।'

আনাস ব্যথার ভঙ্গিতে মুখ বাঁকিয়ে বলল–'আম্মু, সত্যি সত্যিই আমার পেট ব্যথা করছে। উঠতে পারছি না; তিন সত্যি!'

মা এবার বেশ জোরে ধমক দিয়ে বললেন–'আনাস! কেন শুধু শুধু মিথ্যা অভিনয় করছিস! বলেছি না, আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে পছন্দ করেন না! ঝটপট উঠে পড়, না হলে তোর বাবাকে ডাকছি!'

বাবার কথা শুনতেই তড়িঘড়ি করে উঠে বসল আনাস। ছোটো ভাইয়ের কাণ্ড দেখে নকিব চোখ কপালে তুলল। বলল–

'কীরে, পেট ব্যথা একনিমিষেই উধাও হয়ে গেল? জানিসই তো প্রতিদিন উঠতে হয়, কেন শুধু শুধু মিথ্যা অভিনয় করিস?'

মাথা নিচু করে থাকল আনাস। একটু থেমে বলল–'আচ্ছা, আর মিথ্যা অভিনয় করব না।'

বাবা আর দাদু বড়ো দুটি ছাতা নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। নকিব আর আনাস আসামাত্রই সবাই বের হয়ে গেল। মা সালাম দিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

রাতের অঝোর বৃষ্টির পর পুরো এলাকার চেহারাই বদলে গেছে। স্কুলে যাওয়ার পথে অবাক হয়ে নতুন সব দৃশ্য দেখছে আনাস। সামনের পুকুরটা অনেকটাই ভরে গেছে। সজীব ও সবুজ হয়ে উঠেছে রাস্তার ঘাসগুলো। বাতাসে দোল খাচ্ছে বৃষ্টিস্নাত কদম ফুলের রেণু। সবুজ পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা সকালের রোদে ঝিলমিল করছে।

আনাস অবাক হয়ে বলল–'ভাইয়া দেখেছ, পুকুরটা কতখানি ভরে গেছে! কাগজের নৌকা ভাসাতে ইচ্ছে করছে।'

‘গত রাতে বৃষ্টি  হয়েছে, টের পাসনি?’ বলল নকিব।

‘ফজরের সময় একটু টের পেয়েছিলাম, সেজন্যই তো উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। কী সুন্দর সেই বৃষ্টির শব্দ!’

‘বৃষ্টি হয়ে ভালোই হয়েছে, তাই না? দেখ, সবকিছুকেই কী সবুজ আর প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ! গরমে জীবন একেবারে হাঁসফাঁস হয়ে উঠেছিল।’ বলল  নকিব।

‘বৃষ্টি আমার খুব ভালো লাগে। বর্ষাকাল আমার সবচেয়ে পছন্দের ঋতু। তোমার মনে আছে, গত বছর শিশু একাডেমি আয়োজিত ‘প্রিয় ঋতু’ রচনা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছিলাম! সেখানে কিন্তু প্রিয় ঋতু হিসেবে বর্ষাকালই লিখেছিলাম। বাংলা স্যার এটা জানতে পেরে  কী  বলেছিলেন জানো?’

‘কী?’

‘বলেছিলেন, আমি নাকি একটা আস্ত ব্যাঙ, তাই বর্ষাকাল আমার পছন্দ। সবাই প্রিয় ঋতু হিসেবে লিখেছিল বসন্তকাল, আর আমি একাই লিখেছি বর্ষাকাল। আচ্ছা ভাইয়া, তোমার পছন্দের ঋতু কোনটা?’ কৌতূহলী প্রশ্ন করল আনাস।

‘শরৎকাল। সাদা মেঘের ভেলা আর কাশফুল আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু আমি তোর মতো সুন্দর করে রচনা লিখতে পারি না। তাই রচনা লিখলে বইয়ের মুখস্থ করা বসন্তকালই লিখি।’

‘কী বলো! রচনা লেখা তো খুব সোজা। একটু গুছিয়ে লিখলেই হয়, তবে কবিতা লেখা একটু কঠিন। ছন্দ মেলাতে খুব বেগ পেতে হয়; কিন্তু বেশ মজার। জানো, আমি না রচনায় একটা কবিতার লাইন দিয়েছিলাম–

আকাশ থেকে বৃষ্টি নামে অঝোরে

নদী খেত মাঠ জলে যায় যে ভরে।

গাছে গাছে ফোটে কদমের হাসি

বর্ষার সজীব স্নিগ্ধ রূপ ভালোবাসি।’

নকিব হেসে উঠে বলল–‘এই কবিতার কবি কে? তুই নিশ্চয়?’

‘তো আবার কে!’ দুষ্টু হেসে বলল আনাস।

‘তুই ভালোই ছন্দ মেলাতে পারিস, কিন্তু আমি এসব পারি-টারি না। লিখে যা, একদিন বড়ো কিছু হতে পারবি।’

## দুই

স্কুলের কাছে আসতেই বেলের ঢংঢং শব্দ শুনতে পেল তারা। অ্যাসেম্বলির জন্য বেল বাজানো হয়েছে, কিন্তু মাঠে কোনো ছাত্র এসে দাঁড়াল না। মাঠ ভেজা থাকায় আজকে পিটি-প্যারেড হবে না। সিমেন্টে বাঁধা টানা বারান্দা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে ঝকঝক করছে। বাইসাইকেল রাখা টিনের শেডটা থেকে এখনও বৃষ্টির পানি

চুইয়ে পড়ছে। স্কুল বিল্ডিংয়ের হালকা হলুদ রংটা ভিজে গাঢ় রং ধারণ করেছে।

আনাস ও নকিব যার যার ক্লাসে চলে গেল। আনাস ক্লাসে ঢুকতেই শামিম তাকে টেনে পাশে বসাল। সাকিব, মুয়াজ, রাজুও একই বেঞ্চে বসেছে। ওরা পাঁচ বন্ধু, সব সময় একসঙ্গে থাকতে পছন্দ করে।

শামিম চোখ বড়ো বড়ো করে বলল–'জানিস, স্কুলের পেছনের বাগানে না ডাসা ডাসা পেয়ারা ধরেছে! ইয়া বড়ো লেজওয়ালা একটা কাঠবিড়ালি কুটকুট করে খাচ্ছিল। আমাকে দেখে দাঁত খিঁচিয়ে দিলো দৌড়! তারপর হলো কী...'

মুয়াজ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল–'শামিম, তুই খালি চাপা মারিস। আমি তো রোজ ফল বাগানের ভেতর দিয়ে স্কুলে আসি। কোন গাছে কী ফল ধরেছে, সব আমার জানা। পেয়ারা ফুলের কেবল পাপড়ি ঝরে কুঁড়ি হয়েছে। ডাসা ডাসা কোথায় দেখলি? আর আমাদের বাগানের কাঠবিড়ালিটা মেহগনি গাছটাতে থাকে। পেয়ারা গাছে ওটাকে কখনো যেতে দেখিনি। শুধু শুধু কেন বানিয়ে বলিস?'

শামিম কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। রাজু বিরক্তি নিয়ে বলল– 'শামিম শুধু বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে। বাজে একটা স্বভাব। সেদিন আমাকে বলল–একটা মস্ত বড়ো বিদেশি কুকুর নাকি ওদের বাড়ি পাহারা দেয়। তারপর একদিন গিয়ে দেখি সব বোগাস। একটা চামড়া উঠা হাড্ডিসার নেড়ি কুকুর গেটের সামনে শুয়ে আছে। লাথি দিতেই কু কু করে ভাগল। সেই নেড়ি কুকুরটার আবার নাম দিয়েছে টাইগার।'

রাজুর কথায় সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। শামিম লজ্জায় মুখটা নিচু করে ফেলল। প্রসঙ্গ পালটাতে সে ব্যাগ থেকে একটা খেলনার মতো জিনিস বের করে বলল–'এটা আমি বানিয়েছি, এটার নাম কি জানিস?'

আনাস জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখে বলল–'এটা তো কপিকল, একটা সরল যন্ত্র। ঠিক না?'

আমি হতে চাই সিরিজ ▪ ২

# আমি সাহায্যকারী হতে চাই

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান

# আমি সাহায্যকারী হতে চাই

## এক

এবার খুব শীত নেমেছে। সাদা কুয়াশায় সবকিছু ঢেকে গেছে। দুই হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। টিনের চালে টুপটুপ করে শিশির পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি নেমেছে। একটু বাতাস এসে টিনের চালের ওপর ছড়িয়ে থাকা আম গাছের পাতাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। হিম হিম একটা দমকা হাওয়া ঘুলঘুলি দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। নকিব গায়ের লেপটা আরও জড়িয়ে শুয়ে থাকল। ফজরের আজান দিচ্ছে–'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম।'

নকিবের ঘুম ভেঙে গেছে। ফজরের আজানের সাথে সাথেই ওর ঘুম ভেঙে যায়, তবুও সে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে। মায়ের হাতের মিষ্টি ছোঁয়ার জন্য অপেক্ষা করে। এখনই মা আসবেন। তার হাতের ছোঁয়ায় নকিব আর আনাস, দুই ভাইয়ের ঘুম ভাঙবে। যেন রূপকথার জাদুর কাঠির মায়া আছে মায়ের আঙুলে। ঘুম থেকে ওঠার দুআ পড়তে পড়তে আলতো করে মা ডাকছেন। নকিব লেপ সরিয়ে উঠে বসল। আনাসকে উঠাতে একটু বেগ পেতে হয়। মা ওকে পাঁজাকোলা করে উঠিয়ে ওয়াশরুমের বেসিনে দাঁড় করালেন। তারপর চোখে পানির ছিটা দিয়ে দিলেন।

ভারী শীতের পোশাক পরে দাদু, বাবা, নকিব আর আনাস ফজরের নামাজে বের হয়ে গেল।

বাসা থেকে একটু দূরে কলেজ মসজিদ। কলেজের বিশাল সবুজ মাঠটা পেরোলে মসজিদ। তার সাথেই লাল ইটের মক্তব। মাঠের পাশ দিয়ে ইটের সরু রাস্তা চলে গেছে। কুয়াশার জন্য কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবুও চেনা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে ওদের একটুও সমস্যা হচ্ছে না। দাদু গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে দাঁতে

দাঁত লাগিয়ে বললেন– 'এবার অনেক শীত নেমেছে। কতজন যে ঠান্ডায় মারা যাবে, আল্লাহই ভালো জানেন। রক্ষা করো আল্লাহ!'

বাবা বললেন–'হ্যাঁ, খুব শীত নেমেছে। হিমালয় থেকে একটা শৈত্যপ্রবাহ নেমে এসেছে। উত্তরবঙ্গের মানুষের সারা বছরেই কষ্ট। গ্রীষ্মে খরা, বর্ষায় বন্যা আর শীতে শৈত্যপ্রবাহ; আল্লাহ! রক্ষা করো।'

দাদু বললেন–'তবে আমাদের শহরে শীত একটু কম, কিন্তু নদীর ধারে বাঁধের ওদিকটায় অনেক ঠান্ডা পড়েছে। ওখানে সব নদীভাঙা গরিব মানুষগুলো থাকে। আহ! কী কষ্ট-ই না পাচ্ছে!'

নদীর ধারের কথা শুনতেই আনাসের মনটা কেমন করে উঠল। ছোট্ট ঘাঘট নদীর বাঁধের পাড়ে ঝুপড়ি ঘরগুলোতে নদীভাঙা মানুষরা থাকে। গতকাল টিফিনের পর আনাস শেষ দুই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রাজুদের দলের সাথে ওদিকটায় গিয়েছিল।

শীতে নদী শুকিয়ে গেছে। চারদিকে ধানের চারা বুনেছে কৃষকেরা। নদীর ওপাশের চরে দেশি পাখিদের সাথে অতিথি পাখিদের মেলা বসেছে। কত নামের, কত রঙের পাখি! একটু উষ্ণতার জন্য সুদূর সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসে বক, জলপিপি, বালিহাঁস, হরিয়াল, রাজশকুন, তিলেময়না, রামঘুঘু, খঞ্জনা, বুনোহাঁস, সারস, হেরন, ডুবুরি পাখি, রাজসরালিসহ রং-বেরঙের নানা পাখি।

সেই অতিথি পাখি দেখতেই তারা সেখানে গিয়েছিল। রাজু ওদের পাখিগুলো চিনিয়ে দেয়। আনাস বাইনোকুলার দিয়ে দূরে বসা পাখিগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। বাইনোকুলার দিয়ে একে একে ওমর, রাজু, মুয়াজ আর শামিম সবাই দেখেছিল।

ফেরার পথে আনাস বাঁধের ওপরে বাচ্চা কোলে একজন মহিলাকে কাঁদতে দেখল। থমকে দাঁড়িয়ে রাজুকে জিজ্ঞেস করল–'কে উনি?'

রাজু বলল–'উনি পোচুর মা। ওর ছেলে পোচু প্রায় সারা বছরই অসুস্থ থাকে। সব

সময় ওকে কাঁদতে দেখি। ছেলেটা রোগা, মরতে মরতে বেঁচে যায়। তাই ওর নাম হয়েছে পোচু।'

'কী বিশ্রী নাম!' বলল মুয়াজ।

'এখন আবার কী রোগ হলো?' জানতে চাইল ওমর।

রাজু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–'শীতে নদীর পাড়ে প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস বয়। ছাপড়া ঘরগুলোতে মানুষ জমে বরফ হয়ে থাকে। এই ঠান্ডায় নিউমোনিয়া হয়ে অনেক বাচ্চা মারা যায়।'

আনাস মহিলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল–'কী হয়েছে বাচ্চাটার? ডাক্তার দেখান না কেন?'

মহিলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল–'বাচ্চাটার ঠান্ডায় নিউমোনিয়া হয়ে গেছে। ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার দেখানোর পয়সা নাই।'

বাচ্চাটার বুকের পাঁজর ওঠানামা করছে। পাশে বসা পাঁচ বছরের বাচ্চাটার নাক দিয়ে পানি পড়ছে। ময়লা পাতলা একটা গেঞ্জির ওপর ওড়না জড়িয়ে মায়ের পিঠের কাছে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সে।

আনাস আগ বাড়িয়ে বলল–'ওর শীতের জামা নাই? ওরও তো ঠান্ডা লেগেছে!'

মহিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–'শীতের জামা নাই। আমার দুইটা বাচ্চারই অসুখে ধরেছে। কোনোরকমে শীতটা পার করলেই বাঁচি।'

## দুই

সেদিন ফেরার পথে সারাটা পথ চুপ হয়ে ছিল আনাস। ওরা নদীতে জেগে ওঠা পলিমাটির নরম চরে পিকনিক করার প্ল্যান করেছিল। পাখি দেখবে, রান্না করবে, কলাপাতা দিয়ে ঘর বানাবে, নৌকায় ঘুরবে, তারপর গোসল করবে, আরও কত মজার প্ল্যান!

শীতে ঘুরতে বেশ মজা। গ্রীষ্মের মতো তাপদাহ নেই, ঘেমে একাকার হতে হয় না। আবার বর্ষাকালের মতো হুট করে ঝুম বৃষ্টি এসে সব ভিজিয়ে দেওয়ার ভয়ও নেই।

শীতকাল হলো ঘোরার জন্য সেরা সময়। এ সময় বাড়ি বাড়ি নতুন ধানের পিঠা-পায়েসের ধুম লেগে যায়। খেজুরের নালি বেয়ে নেমে আসে অমৃত রস। কী স্বাদ! গাছ থেকে পাতা ঝড়ে পড়ে ন্যাড়া হয়ে যায়। মাথা উঁচু করে গাছগুলোর দিকে তাকালে বুকের ভেতর একটা শূন্যতার হাহাকার বয়ে যায়। আবার পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতায় মচমচ আওয়াজ তুলে হাঁটতে অদ্ভুত আনন্দ লাগে। এই শীত কারও জন্য আনন্দের, আবার কারও জন্য কষ্টের।

হঠাৎ পোচুর মায়ের কথা মনে পড়তেই আনাসের মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে মনে দুআ করল শীতার্তদের জন্য, তারপর মসজিদে প্রবেশ করল।

স্কুল ছুটির পর আনাস তার পাঁচ বন্ধুকে ডেকে আনল। স্কুলের পেছনের বড়ো কাঠ বাগানটার মেহগনি গাছের নিচে সবাই জড়ো হয়ে বসল।

এই বাগানটায় বেশ বড়ো বড়ো সব কাঠগাছ; মেহগনি, শিরিষ, সেগুন আর নাম না জানা কত গাছ। চারদিকে শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। পাতাকুড়ানি কয়েকজন বাচ্চা ঝাড়ু দিয়ে শুকনো পাতা এক জায়গায় করছে। পাতা সরাতেই ধুলা এসে নাকে লাগল।

রাজু একটা বাচ্চাকে ধমক দিয়ে বলল–'এই, এদিকে ঝাড়তে হবে না। দেখছিস না, আমরা বসে আছি!'

বাচ্চাটা ভয় পেয়ে দূরে সরে গেল।

শামিম আনন্দমাখা কণ্ঠে বলল–'কীরে আনাস, আমাদের ডাকলি যে! পিকনিকের প্ল্যান করবি নাকি?'

আনাস চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল–'আরে না, অন্য একটা ব্যাপারে সবাইকে ডেকেছি; খুব জরুরি।'

ওমর অস্থির হয়ে বলল–'ঝটপট বলে ফেল না। এত আনুষ্ঠানিকতার কী আছে?'

আনাস একটু ভেবে বলল–'এবারে খুব শীত পড়েছে, তাই না? খবরে শুনেছি, হিমালয় থেকে একটা শৈত্যপ্রবাহ নেমে এসেছে। গরিব মানুষগুলোর শীতের কাপড় নাই। তাঁরা অনেক কষ্ট পাচ্ছে। তাদের জন্য আমাদের কিছু করা দরকার, তাই তোদের ডেকেছি।'

রাজু ভারী কণ্ঠে বলল–'হ্যাঁ, আমিও খবরে দেখেছি। শীতার্ত মানুষদের কষ্ট টিভির সংবাদে দেখিয়েছে, কিন্তু আমাদের মতো বাচ্চা ছেলেরা এখানে কী এমন করতে পারে!'

শামিম বলল–'আমরা টিফিনের টাকা দিয়ে ওদের শীতের কাপড় কিনে দিতে পারি।'

রাজু বলল–'হুম, কিন্তু এতে কয় টাকাই-বা সংগ্রহ হবে? দশ টাকা করে পঞ্চাশজন ছাত্র মিলে মাত্র পাঁচশত টাকা ওঠে। এটা দিয়ে কয়টা কাপড় হবে? শীতের কাপড়ের তো অনেক দাম।'

আনাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–'তা ঠিক।'

ওমর গা থেকে ওপরের সোয়েটারটা খুলে ফেলল। দুপুরের সূর্যটা তেতে উঠেছে,

আমি হতে চাই সিরিজ ▪ ৩

# আমি উদার হতে চাই

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান

# আমি উদার হতে চাই

## এক

দিনগুলো ভালোই কাটছিল আনাসের, কিন্তু এলোমেলো করে দিলো একটা চিঠি। সে আরও দুইবার চিঠিটা পড়ল। তারপর মুখ বাঁকিয়ে বড়ো ভাই নকিবের দিকে তাকিয়ে বলল– 'গিফট দিলে দেবে, তার আবার অত শর্ত কীসের?'

নকিব পড়া থেকে মাথা উঁচিয়ে বলল–'গিফট পাওয়ার আশায় এবার তোর পজিশন সামনে আসবে, ভালোই হবে।'

মা এসে চিঠিগুলো নাড়াচাড়া করে বললেন–'তোর বাবা আর দাদাকে কোনো চিঠি দেয়নি? শুধু তোদের দুজনকে লিখেছে?'

আনাস মাথা নেড়ে বলল–'না, দেয়নি। দাদা আর বাবা কি বার্ষিক পরীক্ষা দেবে যে তাদের নামে চিঠি আসবে? পড়ে দেখ, কী সব শর্ত দিয়ে চিঠি লিখেছে।'

চিঠি পড়ে মায়ের মুখে মৃদু হাসি ফুটল–'বাহ! শাহেদ তো খুব সুন্দর শর্ত দিয়েছে! এখন থেকে আমিও এই থিউরি অবলম্বন করব, ইনশাআল্লাহ। গিফট পেতে হলে ভালো কাজ করতে হবে, দারুণ!'

আনাস ঠোঁট উলটে বলল–'দারুণ না ছাই! শাহেদ চাচ্চুর কাছে একটা রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার চেয়েছিলাম, এখন কী সব শর্ত দিয়েছে। বার্ষিক পরীক্ষায় এক থেকে পাঁচের মধ্যে থাকতে হবে, সোজা কথা!'

মা হেসে বললেন–'এমন কী কঠিন, একটু চেষ্টা করলেই পারবি। নকিব তো থার্ড হয়েছিল, তারপর গত পরীক্ষায় সেকেন্ড হলো। এবার হয়তো আরও ভালো করবে। ফার্স্ট হতে হবে এমন নয়, কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মেধা দিয়েছেন, এখন একটু পরিশ্রম করেই দেখ।'

‘মা, ছোটো চাচ্চু এবার আমাকে ফার্স্ট হওয়ার শর্ত দিয়েছেন, তাহলে নাকি আমাকেও গিফট দেবেন। চেষ্টা করে দেখি কী হয়!’ নকিব আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল।

মা ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে চলে গেলেন।

সামনে বার্ষিক পরীক্ষা, তাই স্কুল পরীক্ষার আগে এক সপ্তাহের ছুটি দিয়েছে। দুই ভাই মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল।

রানু খালা দুই গ্লাস দুধ দিয়ে গেলেন। দুধ হলো সুষম খাদ্য, এই খাবারে শর্করা, আমিষ, ফ্যাট সবই থাকে। দুধের ক্যালসিয়াম হাড় শক্ত করে, এর পুষ্টিগুণ সম্পর্কে আনাস বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছে। কিন্তু এটা পান করতে তার অসহ্য লাগে। সে মাঝে মাঝে দুধ না খেয়ে বোতলে ভরিয়ে রাখত, এরপর সুযোগ পেলেই পোষা বিড়াল মিনিকে বাড়ির পেছনে নিয়ে গিয়ে বাটিতে করে খাইয়ে দিত। মিনিটা তৃপ্তি নিয়ে

চুকচুক করে খেত। খাওয়া শেষে 'মিয়াও মিয়াও' করে পায়ের কাছে এসে আদর নিত। একদিন মায়ের হাতে ধরাও পড়েছিল। সেদিন মা আনাসকে পিটিয়েছিলেন, মিনিকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মিনি আবার ফিরে এসেছে। এরপর থেকে দুধের গ্লাস খালি না হওয়া পর্যন্ত মা দাঁড়িয়ে থাকেন। আজকে রানু খালা দাঁড়িয়ে আছেন, অসহ্য!

আনাস হাত দিয়ে নাক চেপে 'বিসমিল্লাহ' বলে তিন ঢোকে গ্লাস ফাঁকা করল।

বড়ো বড়ো চোখ করে খালার দিকে তাকিয়ে বলল–'এই হলো তো, এবার গ্লাস নিয়ে যান।'

পরীক্ষা এলে মায়ের খাওয়াদাওয়া নিয়ে অত্যাচার বেড়ে যায়। সারাদিন বাসায় থাকতে হয়, আর এটা-ওটা খেতে বাধ্য করেন।

আনাস বিরক্তি নিয়ে খালাকে বলল–'খালা, দুপুরের জন্য মা কী রান্না করছেন?'

'লালশাক আর করলা ভাজি।'

'উহ, অসহ্য! করলা ভাজি, এই তিতা খাদ্যটা মানুষ কীভাবে যে খায়!'

এটা নাকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, তাই প্রায় প্রতিদিনই এই তিত-করলা মা আনাসকে গিলতে বাধ্য করেন। লালশাক, পুঁইশাক, কলমিশাক, পাটশাক, সরিষাশাক, নাপাশাক আরও কত রকমের যে শাক আছে! খেতে খেতে সবই আনাসের মুখস্থ হয়ে গেছে। শাকসবজিতে প্রচুর ভিটামিন আছে। কোন খাবারে কী কী পুষ্টি আছে, সেগুলোও আনাসের জানা হয়ে গেছে।

আনাস গলা বাড়িয়ে খালাকে বলল–'মাছ-মাংস কিছু রাঁধবে না? খালি শাকসবজি?'

খালা নির্লিপ্ত গলায় বললেন–'হ্যাঁ, রাঁধবে। আলু দিয়ে মলা-ঢেলা মাছের চচ্চড়ি রাঁধা হবে।'

আনাস দাঁত খিচিয়ে বলল–'মা কি বড়ো মাছ চোখে দেখে না?'

নকিব হেসে বলল–'ও রকম বকছিস কেন? তুই বিজ্ঞান বইয়ে খাদ্য ও পুষ্টি

অধ্যায়টা পড়িসনি?'

'পড়েছি। আমি জানি তো, ছোটো মাছে ভিটামিন এ আছে—যা রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে।'

'হ্যাঁ, সেই জন্যই তো মা বেছে বেছে পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার আমাদের খাওয়ান। মা আমাদের ভালো চান, তাই এসব খাবার খাওয়ান, বুঝলি?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম। আমার যতসব অপছন্দের খাবারের মধ্যেই আল্লাহ পুষ্টি দিয়েছেন, আর মা সেগুলো বেছে বেছে খাওয়ান। সকালে উঠে মধু আর কালোজিরা খেতে দেন, বিকেলে টক সরবত, অসহ্য! টক আমি একদম পছন্দ করি না, অথচ এটা নাকি ভিটামিন 'সি'-তে ভরপুর! লেবু, আমলকী, জাম্বুরা —এগুলোর নাম মনে করলেই আমার দাঁত টক হয়ে যায়।'

নকিব মাথা নেড়ে বলল—'হ্যাঁ, টক আমারও ভালো লাগে না, তবুও ভিটামিন 'সি'-এর জন্য খাই। মধু খেতে অবশ্য খারাপ লাগে না। কারণ, মধুর কথা আল কুরআনে আছে। সূরা নাহলের ৬৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—"মৌমাছির পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানি নির্গত হয়, তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার।""

'হ্যাঁ, মধু খেতে অতটা খারাপ লাগে না, কিন্তু কালোজিরা কেমন যেন একটু তিতা স্বাদের, ভালো লাগে না।'

'খারাপ লাগলেও খেতে হবে, এটাতে প্রচুর ঔষধি গুণ আছে, যা বর্তমানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন। অথচ এটা চৌদ্দ শ বছর আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন। তিনি বলেন—"তোমরা কালোজিরার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করো। কেননা, তাতে মৃত্যু ব্যতীত সব রোগের নিরাময় আছে।""*

আনাস বিজ্ঞের মতো বলল—'হ্যাঁ, বুঝেছি। ভাইয়া, একটা জিনিস খেয়াল করেছ?'

'কী?'

'সব পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবারগুলো হয় তিতা, টক, নাহয় কম দামি। যদি সব পুষ্টি দামি

খাবারে থাকত, তাহলে দরিদ্র মানুষরা পুষ্টিহীন হয়ে যেত, তাই না? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কত চমৎকার সৃষ্টি!'

নকিব মাথা নেড়ে বলল–'হ্যাঁ, তিনিই তো আলিম, সর্বজ্ঞানী।'

দুপুর পর্যন্ত পড়ে দুই ভাই গোসল সেরে নামাজ পড়ল। খাওয়ার পর আবার একটু বই নিয়ে বসল। আসরের আজান দিতেই আনাস বই বন্ধ করে টেবিল থেকে উঠে পড়ল।

নামাজ পড়েই সে মাঠের দিকে ছুটতে লাগল। হেমন্তকাল শেষ হতে যাচ্ছে, শীত আসি আসি করছে।

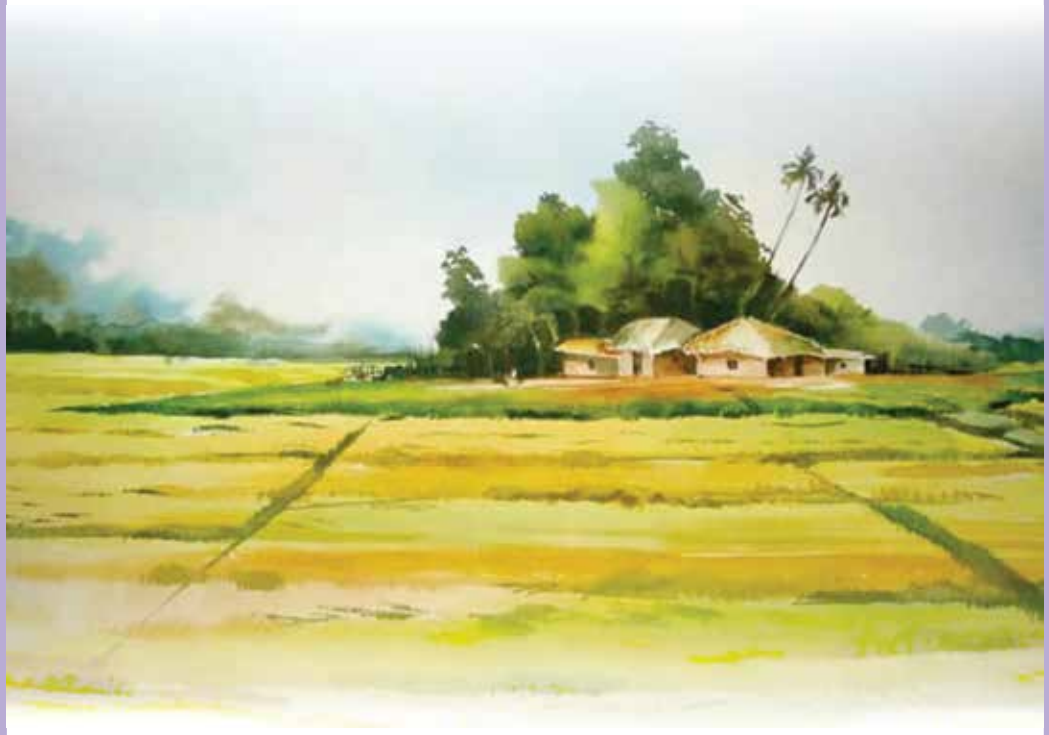

দূরের ফসলের মাঠগুলো পাকা ধানে ভরে গেছে। আনাস প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিয়ে ছড়া কাটল–

'সবুজ পাতার খামের ভেতর

হলুদ গাঁদা চিঠি লেখে

কোন পাথারের ওপার থেকে

আনল ডেকে হেমন্তকে।'

এক দৌড়ে মেঠো পথটা পার হলো, সেখান থেকে একটু ডানে বিশাল সবুজ মাঠ। মাঠের দিকে তাকাতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। একটা মাথাও নেই; কেউ আসেনি। সবাই বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। তাই বলে বিকেলেও কেউ পড়তে বসে? বাবা-মায়েরা যে কী প্রেশার দেয়! পরীক্ষা এলেই গার্ডিয়ানরা একেকজন হিটলারের রূপ ধারণ করে।

আনাস মন খারাপ করে হাঁটতে থাকে। মাঠের একদম শেষে বিশাল তেঁতুল গাছ। তার একটু কাছেই বটগাছ। গাছের ডাল থেকে অনেক ঝুড়ি নেমে এসে মাটির সাথে যেন মিশে যেতে চাচ্ছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীতকালে বটগাছটা ছোটো ছোটো লাল ফলে ভরে থাকে। সেই ফল খেতে কত পাখি যে ভিড় করে! এ ডালে ও ডালে উড়াউড়ি করে, আর একটু করে ঠোকর দিয়ে ফল খায়। পাকা ফলের শেষ অংশ ঠোঁটের আঘাতে মাটিতে থপথপ করে পড়ে যায়। লাল ফল সাদা মাটির অনেকখানি জায়গা জুড়ে লাল-সাদার অদ্ভুত সুন্দর আলপনা তৈরি করে।

এখন হেমন্তকাল। বটগাছে ফল নেই, কেবল নতুন পাতা গজাচ্ছে। বটগাছের শূন্য তলাটা দেখে আনাস দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

গাছের কাছে আসতেই কান ফাটানো 'টিলো' শব্দে সে চমকে উঠল।

ওমর হাসতে হাসতে বলল–'তোকে কেমন চমকে দিলাম, তাই না! দূর থেকে তোকে দেখেই আমরা গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলাম।'

'আমাকে ভড়কে দিয়ে খুব মজা করা হচ্ছিল! এখন বল, কী খেলছিলি তোরা?'

'তুই বল দেখি, কী খেলছিলাম?' শামিম পালটা প্রশ্ন করল।

আনাস এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল–'মাটিতে দাগ কাটা দেখছি। তাহলে তোরা

আমি হতে চাই সিরিজ ▪ ৪

# আমি পরিচ্ছন্ন মানুষ হতে চাই

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান

# আমি পরিচ্ছন্ন মানুষ হতে চাই

## এক

লোকটাকে দেখলেই কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। দেখতে মোটাসোটা, লোমশ পেশিবহুল হাত, রাগী রাগী চেহারা; সব মিলিয়ে মারমুখী মনে হয়। প্রতিদিন সকালে দোকানটার সামনের বেঞ্চিতে বসে চা খায় আর খুঁতখুঁতে চোখে রাস্তা দিয়ে যাওয়া মানুষদের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্কুলে যাওয়ার পথে আনাসের সাথে প্রায় প্রতিদিনই চোখাচোখি হয়। ভয়ে কুঁকড়ে যায় আনাস। আজকেও লোকটা বসে আছে। গায়ে সেই একই কাপড়; হাফহাতা শার্টের ওপর সবুজ রঙের কটির মতো অদ্ভুত পোশাক।

আনাস বুকে সাহস সঞ্চয় করে দোকানটার দিকে এগোল। আজকে এই দোকানে তাকে যেতেই হবে। এই দোকানে কলা পাওয়া যায়, তারিকের ময়না পাখিটার জন্য দুটি কলা কিনতে হবে। স্কুল ছুটির পর তারা বন্ধুরা মিলে তারিকদের বাসায় যাবে। খালি হাতে তো আর পাখি দেখতে যাওয়া যায় না।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আনাস ডাকল–'চাচা, চারটা কলা দেন তো।'

মধ্যবয়স্ক দোকানদার কলার কাঁদি থেকে কলা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল–'দাম কিন্তু বাড়তি। টাকা আছে তো, খোকা? আমি আবার বাকিতে জিনিস বেচি না।'

আনাস শার্টের পকেট থেকে একটা বিশ টাকার নোট বের করে বলল–'কত হয়েছে?'

'ষোলো টাকা।'

চার টাকা ফেরত নিয়ে আনাস আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। শুধু শুধু লোকটাকে এতদিন সে ভয় পেত। যদিও পুরো সময়টা লোকটা কেমন করে যেন ওর দিকে তাকিয়েছিল, খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সে আড়চোখে লোকটার গায়ের কটিতে লেখা শব্দগুলো পড়ে নিয়েছে। সবুজ কটির বুকের দিকটায় লাল রঙের 'ক্লি...'-এর মতো কী জানি লেখা।

'ক্লি'-তে কী হয়? তা যা হোক গে, লোকটার গায়ে কীরকম যেন বোটকা গন্ধ! আনাস ভাবতে ভাবতে একটা কলা ছিলে খোসাটা রাস্তায় ফেলে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ কাঁধে কারও শক্ত হাতের স্পর্শে সে ফিরে তাকাল। সেই লোকটা! কী চায় তার কাছে!

ভয়ে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল আনাসের।

লোকটার গা থেকে তীব্র বোটকা গন্ধ আসছে; চোখগুলো লাল, দৃষ্টি ঘোলাটে। লোকটা দাঁত বের করে একটু হেসে বলল–'খোকা, তুমি এটা কী করেছ?'

আনাস আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করল–'আমি...আমি...কী করেছি...'

হঠাৎ সে ভয় পেয়ে দিলো এক দৌড়।

দৌড়াতে দৌড়াতে একেবারে স্কুলের গেইটের সামনে এসে থামল।

স্কুলের কাছে আসতেই শামিমের সাথে দেখা হলো। শামিম ওর দিকে তাকিয়ে বলল– 'কোনো সমস্যা? কুকুর তাড়া করেছিল নাকি?'

আনাস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল–'না, একটা ঘটনা ঘটেছে, পরে বলব। অ্যাসেম্বলির ঘণ্টা দিয়েছে, তাড়াতাড়ি চল। দেরি করলে পিটি স্যারের লাঠির বাড়ি খেতে হবে।'

মাঠে সবাই লাইন ধরে দাঁড়াল। এখন শরৎকাল। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে, ঝকঝকে মন ভালো করা রোদ। বারান্দার সামনের শিউলি ফুল গাছটা থেকে টুপটুপ করে সাদা-জাফরান রঙের শিউলি ফুল সবুজ ঘাসের ওপর পড়ছে। শরতের বাতাসে শিউলির গন্ধ ভেসে আসছে, আনাস বুক ভরে নিশ্বাস নিল।

এ সময় পিটি করতে তেমন কষ্ট হয় না। অনেকক্ষণ শারীরিক কসরত চলল। পিটি শেষে হেডস্যার মেঘস্বরে ঘোষণা দিলেন–'এই ছাত্ররা! সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো। ঢাকায় একটা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, তোমরা কি তা জানো?'

সবাই সমস্বরে বলল–'না, স্যার! জানি না।'

হেডস্যার গজগজ করে বললেন–'না জানারই কথা, তোমরা তো পেপার-পত্রিকা কিছুই

পড়ো না। এডিস মশার কামড়ে মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। এটা কেন হয় জানো?'

ছাত্ররা এবারেও মাথা নেড়ে বলল–'না।'

'এটা হয় পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখার জন্য। জমানো পানি ও ফেলে দেওয়া শুকনো পাত্রে এই মশা ডিম পাড়ে। তাহলে এখন আমাদের কী করা উচিত?'

ছাত্ররা এবারে আর চুপ থাকল না, জোরে চ্যাঁচিয়ে বলল–'পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।'

হেডস্যারের মুখে হাসি ফুটল। বললেন–'গুড, ভেরি গুড। আমরা স্কুল পরিষ্কার রাখছি কি না, ছাত্রদের এসব শেখাচ্ছি কি না, তা পরিদর্শনের জন্য জেলাপ্রশাসকসহ আরও অনেকে আগামী শনিবার স্কুলে আসবেন। সেই উপলক্ষ্যে আমরা পুরো স্কুল এই দুই দিনে পরিষ্কার করব। আজকে ক্লাসে তোমাদের এই বিষয়ে শিক্ষকেরা শেখাবেন, বুঝলে?'

ছাত্ররা চিৎকার করে বলল–'জি স্যার।'

বাংলা স্যার ঘোষণা দিলেন–'আজকে দুপুর ১২টায় "পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের করণীয়"–এই নিয়ে একটা রচনা প্রতিযোগিতা হবে। যারা যারা অংশ নিতে ইচ্ছুক, তারা হলরুমে ঠিক বারোটায় চলে আসবে।'

ছাত্ররা আবার চিৎকার করে বলল–'জি স্যার।'

পিটি স্যার বেত ঘুরিয়ে বলল–'এবার আমরা শপথ করি...'

ছাত্ররা মুষ্টিবদ্ধ হাত সামনে বাড়াল।

পিটি স্যার উচ্চৈঃস্বরে বললেন–

'সবাই মিলে শপথ করি

পরিচ্ছন্ন দেশ গড়ি।'

আকাশে-বাতাসে শপথ বাক্যের প্রতিধ্বনি হলো।

অ্যাসেম্বলি শেষে সবাই লাইন ধরে চলে গেল যার যার ক্লাসে।

আনাস চিন্তিত হয়ে বেঞ্চিতে বসল। গতবার শিশু একাডেমি আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় সে প্রথম হয়েছিল, কিন্তু এবারের বিষয় খুব কঠিন; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে লিখতে হবে। মাথায় কিছুই আসছে না।

ওমর ওকে চিন্তিত দেখে বলল–'কী নিয়ে এত চিন্তা করিস?'

'রচনা প্রতিযোগিতায় কী যে লিখব, তা-ই ভাবছি।'

ওমর আনাসের পিঠ চাপড়ে বলল–'এবারেও তুই-ই ফার্স্ট হবি, দেখিস। তুই তো খুব ভালো লিখতে পারিস।'

ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। বাংলার শিক্ষক সাজেদ মণ্ডল স্যার একগাদা কাগজ নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। ক্লাস ক্যাপ্টেন সিয়ামকে কাছে ডেকে বললেন কাগজগুলো সবাইকে বিলি করতে।

সবার হাতে কাগজ পৌঁছলে সাজেদ স্যার মাহমুদকে দাঁড় করিয়ে বললেন–'এই কাগজটা পড়ে ফেল দেখি।'

মাহমুদ এই ক্লাসে 'কবি' বলে পরিচিত। ওর লেখা কবিতা আর গল্প পত্রিকার শিশু-কিশোর পাতায় প্রায়ই প্রকাশিত হয়। ওর বাংলা উচ্চারণও চমৎকার, তাই সাজেদ স্যার সব সময় ওকে দিয়েই পড়া ধরতে শুরু করেন।

মাহমুদ আত্মপ্রত্যয়ী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়া শুরু করল–'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, স্কুল-কলেজ, বাজার-ঘাট, অফিস-আদালত এবং আমাদের আশেপাশের এলাকাসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য আমাদের যা যা করা উচিত...

১. যেখানে-সেখানে রাস্তায় কফ, থুথু ফেলব না।

২. ময়লা-আবর্জনা, খাবারের অবশিষ্টাংশ ডাস্টবিনে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলব।'

মাহমুদ এক এক করে পড়তে থাকল।

পড়া শেষ হলে স্যার এক এক করে পড়া ধরলেন। তারপর আনাসকে দাঁড় করিয়ে বললেন–'যারা আমাদের শহর পরিষ্কার রাখেন, তাদের কি বলে, জানিস?'

আনাস বলল–'জি স্যার, তাদের পরিচ্ছন্নকর্মী বা ক্লিনার বলে।'

স্যার মাথা নেড়ে বললেন–'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। আমাদের সবাইকেই পরিচ্ছন্নকর্মী হতে হবে।'

আনাস ঠোঁট উলটিয়ে মনে মনে বলল–'একেক সময় একেক কথা। আমরা কেন ক্লিনার হব? এটা একটা পেশা হলো! আমরা হব ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, শিক্ষক, পাইলট–এমন বড়ো কিছু। স্যার এসব কী বলছেন–যত্ত সব!'

ওমর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল–'স্যার, আমরা বড়ো হয়ে পরিচ্ছন্নকর্মী মানে ক্লিনার হব?'

স্যার মৃদু হেসে বললেন–'বড়ো হয়ে নয়, সব সময়ের জন্যই আমরা পরিচ্ছন্নকর্মী হব। আমরা নিজেদের শরীর, কাপড়চোপড় পরিষ্কার রাখব। খাবারের প্যাকেট, ময়লা-আবর্জনা সব সময় ডাস্টবিনে ফেলব। আমাদের ঘর, আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করব। এভাবেই আমরা একেকজন সারাজীবনের মতো পরিচ্ছন্নকর্মী হিসেবে কাজ করে যাব, বুঝলি!'

বাংলা ক্লাস শেষ হলো। ইংরেজি স্যার আসতে কেন যেন দেরি করছেন। ইংরেজির শিক্ষক আনোয়ার হোসেন প্রচণ্ড রাগী। ক্লাসে কেউ দুষ্টুমি করলে কঠিন শাস্তি দেন। ক্লাসের ছেলেরা হইচই করছে।

রোমান নামের দুষ্টু একটা ছেলে ফারুককে ভেঙাচ্ছে–

'ভাগাড়ের পোলা...

আশি টাকা তোলা...'

ফারুক রেগে উঠে বলল–'খবরদার! আমাকে এভাবে ভেঙাবি না। মেরে হাড্ডি ভাঙব!'

আমি হতে চাই সিরিজ ■ ৫

# আমি সহনশীল হতে চাই

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান

# আমি সহনশীল হতে চাই

## এক

ফাতিমার মনে একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে দুশ্চিন্তা। আজ ছোটো খালামণি সপরিবারে ঢাকা থেকে আসবেন, কত কিছু যে আনবেন! কিন্তু খালাতো ভাই শিপলু-পিপলু তো ভারি দুষ্টু! গতবার এসে শিপলু ভাইয়া ওর ড্রয়িং খাতার পেজ ছিঁড়ে প্লেন বানিয়েছে, আর পিপলু ভাইয়া ওর মাটির ব্যাংকটা আছাড় মেরে ভেঙে দিয়ে গেছে।

বাসায় মেহমান আসা উপলক্ষ্যে বাড়ির সবাই খুব আনন্দ নিয়ে কাজ করছে। আম্মু মজার মজার রান্না করছে। রানু খালা সব রুম গুছিয়ে রাখছেন।

ফাতিমা বাগান থেকে খালামনির পছন্দের কিছু ফুল তুলে আনল। ফুলদানির ভেতর পানি দিয়ে পাতাবাহারের ডাল আর ফুলগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে রাখতে আনাসকে বলল–'এত সুন্দর করে সাজালাম, এখন শিপলু আর পিপলু ভাইয়া এগুলো না ভাঙলেই হয়। ওদের যে জেদ!'

আনাস বলল– 'হুম, ওরা খুব দুষ্টু। গতবার আমার লাল গাড়িটার চাকাগুলো খুলে নিয়ে গেছে। এবার কিছু করেই দেখুক, আমিও মজা দেখাব।'

আনাস হাত মুষ্টি করে নিজের হাতে নিজেই কিল দিলো।

নকিব ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল–'আনাস, ফাতিমা, তোরা এখন এসব আলোচনা বন্ধ কর। ঢাকা থেকে আসা রাতের ট্রেন স্টেশনে চলে এসেছে, ওনারা এক্ষুনি চলে আসবেন। এসব শুনলে তারা কষ্ট পাবেন। খালামণি তোদের জন্য কত কিছু নিয়ে আসেন। গতবার আনাসের জন্য একটা বড়ো প্লেন আর ফাতিমাকে লোগো সেট দিয়েছিল, মনে নেই?'

আনাস বলল–'নকিব ভাইয়া, খালামণি আর খালু তো খুব ভালো, কিন্তু শিপলু-পিপলু কেমন যেন! একটুও ভালো লাগে না।'

কলিংবেল বেজে উঠল। বাবা দরজা খুলে দিলেন।

নকিব, আনাস আর ফাতিমা এসে দাঁড়াল। নকিব হাসিমুখে কাছে গিয়ে বলল–'আসসালামু আলাইকুম, খালামনি। জার্নিতে কষ্ট হয়নি তো?'

খালামণি নকিবের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন–'না, রাতের জার্নি তো আরামের। কেবিনে আমরা আরাম করে ঘুমিয়েছি। তবে তোমাদের খালু ভালো ঘুমাতে পারেনি। বড়োসড়ো মানুষ তো, হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমানোর অভ্যাস। অতটুকু জায়গায় কী আর ঘুমাতে পারে, বেচারা!'

খালু হেসে বললেন–'আরে না! বসে বসেই ঘুমিয়েছি। অনেকে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও ঘুমাতে পারে। বলো তো দেখি, কারা দাঁড়িয়ে ঘুমাতে পারে?'

খালুকে নকিবের খুব ভালো লাগে। দেখতে বেশ বড়োসড়ো, গম্ভীর মনে হলেও আসলে তিনি বেশ মজার মানুষ। শিশুদের তিনি খুব ভালোবাসেন। বাচ্চাদের সাথে মজার মজার ধাঁধা আর কৌতুক করেন।

আনাস গর্বের সাথে বলল–'খালু, আমিও দাঁড়িয়ে ঘুমাতে পারি। একবার পড়া না পারায় স্যার আমাকে ক্লাসে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!'

খালু হেসে উঠে বললেন–'তাহলে তো তুমি একটা আস্ত ঘোড়া। কারণ, প্রাণীদের মধ্যে ঘোড়ারাই কেবল দাঁড়িয়ে ঘুমায়।'

আনাস লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল। শিপলু-পিপলু ওর দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপের হাসিতে ভেঙে পড়ল।

নকিব হাসতে হাসতে বলল–'খালু যে তোকে গাধা বলেননি, তাতেই খুশি থাক।'

মা এসে সবাইকে থামিয়ে দিলেন। আনাস মায়ের ওড়নার নিচে মুখ লুকাল। তিনি শিপলু আর পিপলুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন।

সবাই হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসল। সরিষার তেলে রান্না খিচুড়ি আর হাঁসের মাংস। সুঘ্রাণে চারদিক ভরে গেল। খালু প্লেটে খাবার নিয়ে বললেন–'আহ, কী সুঘ্রাণ! কতদিন এমন স্বাদের খাবার খাই না।'

শিপলু মুখ ভ্যাংচে বলল–'মজা না ছাই! খিচুড়ি একটা খাবার হলো? আমার এসব ভালো লাগে না। বার্গার, স্যান্ডউইচ, হটডগ, পেটিস, চিকেন ফ্রাই–এসব নেই? আমি ব্রেকফাস্টে ফাস্টফুড ছাড়া কিছু খাই না।'

খালামনি রেগে গিয়ে বললেন–'শিপলু, বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু! এগুলো খেতে না পারলে না খেয়ে থাকো। জার্নি করে এসে টায়ার্ড হয়ে গেছি, এখন কিছুই করতে পারব না।'

শিপলু দাঁত কিড়মিড় করে বলল–'মাম্মি, আমাকে অন্তত একটা পাউরুটি টোস্ট করে দাও, জেলি দিয়ে মাখিয়ে খাই।'

খালু খেতে খেতে বললেন–'শিপলু বাবা, একটু খেয়ে দেখো। কী মজাই না হয়েছে! জানো, ছোটোবেলায় আমরা তেমন গোশত খেতে পেতাম না। কখনো কোনো মেহমান এলে হয়তো তার জন্য ঘরে পালা মুরগি বা হাঁস জবাই করা হতো। সেদিনটায় আমরা ঈদের আনন্দ পেতাম। সবজি আর শাক ছিল আমাদের নিত্যদিনের খাবার। তারপরও আমরা কখনো খাবার নিয়ে জেদ করতাম না। যা পেতাম, তা-ই খেতাম। এ নিয়ে কখনো মাকে কষ্ট দিতাম না। আর তোমরা?'

খালু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

খালামনি একটু চুপ থেকে বললেন–'না খেতে পারার কষ্ট কি এরা বোঝে? কোনো দিন

তো ওদের ক্ষুধার্ত রাখোনি। যা চেয়েছে, সাথে সাথেই এনে দিয়েছ। এখন পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে; আমি আর পারি না।'

শিপলু ব্যাগ থেকে পাউরুটি বের করে এনে গপগপ করে খেতে খেতে বলল–'লাগবে না। আমার জন্য কারও কিছুই করা লাগবে না। শুধু পাউরুটি খেয়েই থাকব।'

পিপলু শিপলুর তিন বছরের ছোটো। সে অবশ্য খাওয়া নিয়ে তেমন ঝামেলা করে না। একটা পছন্দসই ভিডিও গেম অথবা ইউটিউবে ভিডিও ধরিয়ে দিলেই গপগপ করে খেতে পারে। খাওয়া শেষ হলে বলতেও পারে না যে কী খেলো!

খাওয়া শেষ হলে খালু ড্রয়িংরুমে জম্পেস আড্ডা বসালেন। খালু হাত নেড়ে নেড়ে মজার সব গল্প বলছেন, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। হঠাৎ পিপলু শোকেস খুলে ঝুঁড়িতে সাজানো মাটির একটা আপেল বের করে তা শূন্যে ছুড়ে খেলতে লাগল।

ফাতিমা দৌড়ে এসে বলল–'পিপলু ভাইয়া, আপেলটা মাটির, ভেঙে যাবে তো! প্লিজ ওটা আমাকে দিয়ে দাও। এগুলো কুমারপাড়া থেকে বানিয়ে এনেছি। এটা আমার খুব ফেভারিট। প্লিজ ভেঙে ফেলো না, দিয়ে দাও!'

পিপলু রাগী গলায় বলল–'ভাঙবে না। এটা দিয়ে আমি খেলব। আমাকে বিরক্ত করো না তো।'

পিপলু আরও জোরে আপেলটা শূন্যে ছুড়তে লাগল। ফাতিমার দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থা! যে করেই হোক আপেলটা নিতে হবে। সে পিপলুর হাত থেকে আপেলটা নেওয়ার জোর চেষ্টা করল। দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ হাতাহাতিও হলো। ফাতিমা পেরে উঠতে না পেরে একটু থামল। তারপর পিপলুর হাতে একটা জোরে কামড় বসিয়ে আপেলটা নিয়ে দিলো দৌড়।

পিপলু–'ও মাগো!' বলে চিৎকার করে হাত-পা ছুড়ে মেঝেতে বসে কাঁদতে লাগল।

মা আর খালামনি এসে দুজনকেই থামানোর চেষ্টা করলেন। মা ফ্রিজ থেকে একটা সবুজ আপেল নিয়ে এসে বলল–'পিপলু বাবা, এটা নাও। এটা দিয়ে খেলতেও পারবে, আবার খেতেও পারবে।'

পিপলু মাথা নেড়ে চিৎকার করে বলল–'না, এটা নেব না। লাল টুকটুকে মাটির আপেলটাই আমার চাই। অন্য কিছুই নেব না।'

খালামনি পিপলুর পিঠে জোরে একটা চাপড় মারলেন।

ফাতিমা বিছানায় ওপর হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর বালিশের নিচে দুই হাতের মুঠোয় শক্ত করে আপেলটা ধরে রেখেছে।

মা ফাতিমার পিঠে আলতো করে হাত রেখে বললেন–'মা, ওরা তো আমাদের গেস্ট। আপেলটা পিপলুকে দিয়ে দাও।'

ফাতিমা চিৎকার করে কেঁদে উঠল–'না, এটা আমার। এটা কাউকে দেবো না।'

মা আর খালামনি কেউ-ই পিপলু আর ফাতিমাকে থামাতে পারল না। গল্পের আসর থেমে গেছে। হাসির আওয়াজের পরিবর্তে একটানা 'অ্যা অ্যা...ভ্যা ভ্যা...' কান্নার আওয়াজে পুরো ঘর ভরে গেছে।

## দুই

পরের দিন ভোর। সবাই মিলে নানার বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলো। আনাসদের এলাকার একেবারে শেষ প্রান্তে নদী।

এখন বসন্তকাল, নদীতে স্রোত নেই, নাব্যতা কমে গেছে। নকিব-আনাস খুব আনন্দ নিয়ে বালির মধ্যে হাঁটছে। শিপলু-পিপলু মুখ ভার করে থপথপ করে হাঁটছে। নদীর এপার থেকে রূপগ্রামের সবুজ দিগন্তরেখা দেখা যাচ্ছে। সবুজ আর আকাশের নীলের একটা মিশ্রণ। কী অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য! নকিব মুগ্ধ দৃষ্টিতে উপভোগ করছে এই দৃশ্য! ইস! পাখির মতো যদি উড়ে যাওয়া যেত! ওখানে যাওয়া অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার, বালির রাস্তায় মহিষের গাড়ি ছাড়া আর কোনো বাহন নেই।

মহিষের সাথে বাঁশের গাড়ি সংযুক্ত কয়েকটা গাড়ি নিয়ে গাড়িয়ালরা নদী পারাপারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। খালু এগিয়ে গিয়ে একটা গাড়ি সারাদিনের জন্য ভাড়া করলেন।

পিপলু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল–'মাম্মি, পায়ের মধ্যে বালি ঢুকে যাচ্ছে। ওহ, নো! ইটস ডিসগাস্টিং।'

শিপলুর মোটা শরীর নিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। সে চোখ পাকিয়ে বলল–'আব্বু, এটা একটা জায়গা হলো! কী বালি! পায়ের মধ্যে সব ঢুকে যাচ্ছে। এই রোদের মধ্যে তো তাকাতেই পারছি না। আমি আর যাব না, এখানেই বসে থাকব। তোমরা যাও।'

আমি হতে চাই সিরিজ ▪ ৬

# আমি কৃতজ্ঞ হতে চাই

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান

# আমি কৃতজ্ঞ হতে চাই

## এক

'আজকেও স্যারের বেতের বাড়ি খেতে হবে, দেরি হয়ে গেল।' আনাস নিচের ঠোঁট চেপে প্রায় দৌড়াতে থাকল।

বাসা থেকে ঠিক সময়েই বেরিয়েছিল, কিন্তু পথে দেরি হয়ে গেল। রাস্তার ধারে বড়ো আমগাছটায় একটা কাক বাসা বেঁধেছে, তিনটা বাচ্চাও দিয়েছে। ওগুলোর চিঁচিঁ আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। আনাসের কৌতূহল বরাবরই একটু বেশি। সে তরতর করে গাছে উঠে বাচ্চাগুলোকে একঝলক দেখেছে। কী সুন্দর ছোটো ছোটো বাচ্চা! মুখের ভেতরটা লাল, আর কেমন করে যেন চ্যাঁচাচ্ছিল। বিকেলে স্কুল ছুটির পর আবার দেখবে বলে ঠিক করল।

হাঁপাতে হাঁপাতে স্কুলের গেইট পার হলো; প্রথম ক্লাসের ঘণ্টা ইতোমধ্যেই দিয়েছে। স্যার চলে এসেছেন বোধ হয়। প্রথম ক্লাস বাংলা। বাংলা স্যার সাজেদ মণ্ডল খুব কড়া; সময়ানুবর্তিতা মেনে চলেন।

ক্লাসের সামনে এসে আনাস করুণ স্বরে ডাকল–'আসসালামু আলাইকুম স্যার, আসতে পারি?'

স্যার প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে বললেন–'প্রতিদিন কেউ না কেউ দেরি করে আসিস, সময়ানুবর্তিতা আর তোদের শেখাতে পারলাম না। যা, তাড়াতাড়ি বসে পড়।'

বসার পর আনাস বুঝতে পারল, স্যার কেন তাকে না মেরে রেকর্ড ভাঙলেন। ক্লাসে নতুন একজন ছেলে ভর্তি হয়েছে, তাকে নিয়েই স্যার ব্যস্ত। ছেলেটা স্যারের ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। কেমন যেন পণ্ডিত পণ্ডিত চেহারা, চুল

কোঁকড়া; গোলগাল ফরসা মুখ। স্যার ওর নাম খাতায় লিখলেন।

তারপর খাতা থেকে মুখ তুলে বললেন–'এই ছেলেরা শোনো! আব্দুল্লাহ সাদ আমাদের স্কুলে নতুন ভর্তি হলো। ময়মনসিংহ থেকে ওর বাবা ট্রান্সফার হয়ে এসেছে। ওর চোখে সমস্যা, কখনো ওর সাথে কেউ মারামারি করবি না। কোনো অভিযোগ পেলে পিটিয়ে ছাল তুলে দেবো, মনে রাখিস। এই আব্দুল্লাহ, তোর সম্পর্কে কিছু বল, সবাই শুনুক।'

আব্দুল্লাহ ক্লাসভর্তি ছেলেদের সামনে কথা বলতে আড়ষ্ট বোধ করল। জড়োসড়ো ভঙ্গিতে অসহায় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে বলল–'আমার নাম আব্দুল্লাহ সাদ। আমাকে সবাই সাদ বলেই ডাকে। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বিখ্যাত সাহাবির নাম। আমার দাদু তাঁর নামে নাম রেখেছেন। আমার আব্বু কলেজের অধ্যাপক। প্রতি তিন বছর পরপর তাঁর বদলি হয়। আমি এর আগে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ছিলাম।'

স্যার ধমকের স্বরে বললেন–'আসল কথাটাই তো বললি না, যেটা তোর মা বারবার আমাকে ছাত্রদের বলতে অনুরোধ করে গেছেন।'

সাদ বিষণ্ন মুখে বলল–'আমার মায়োপিয়া আছে। আমি স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন; চশমা ছাড়া দূরের কিছুই দেখতে পাই না। আমার চশমার পাওয়ার অনেক, মাইনাস আট। আমার সাথে কেউ যেন মারামারি না করে, চশমা না ভেঙে ফেলে, সে ব্যাপারে মা সবাইকে সতর্ক করতে বলেছেন।'

শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে সাদের গলা কেঁপে উঠল, যেন সে শারীরিক দুর্বলতার কথা কাউকে জানাতে চাচ্ছে না। সবাই তার দিকে কেমন কৌতূহলী আর করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, এটা তার ভালো লাগে না।

টিফিন পিরিয়ডে আনাসসহ সবাই সাদের সাথে গল্প করল। ডানপিটে সাকিব হঠাৎ সাদের চশমা চোখ থেকে খুলে নিয়ে বলল–'দেখি, তুই কত দূরের জিনিস দেখতে পাস না?'

সে একটু দূরে গিয়ে হাত নেড়ে বলল–'বল তো সাদ, এখানে কয়টা আঙুল?'

সাদ আমতা আমতা করে বলল–'ঝাপসা দেখছি, মনে হচ্ছে চারটা।'

সাকিব সাদের চশমা ফিরিয়ে দিয়ে ওর মাথায় একটা গাট্টি মেরে বলল–'তিনটা ছিল, তুই তো আসলেই একটা কানাবাবা!'

'কানাবাবা! বাহ! এই নামটা তো বেশ মানাবে তোকে। ক্লাসের সবারই আমরা একটা করে নাম দিয়েছি, বুঝলি!' হাসতে হাসতে বলল শামিম। সবাই তার সাথে হাসিতে যোগ দিলো।

আনাস বলল–'একটা ধাঁধা ধরি। দেখি, তুই বলতে পারিস কি না?

কোন সে শয়তান,

নাকে বসে ধরে কান?'

সাদ চুপ করে থাকল।

শামিম হাসতে হাসতে ছড়া কাটল–

'শয়তান ধরে সাদের কান,

কানাবাবা তাই দৃষ্টি পান।'

সাদের মনটা মুহূর্তেই খারাপ হয়ে গেল। তার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে পড়ল। যেখানেই সে যায়, সবাই তাকে খোঁচায়। কেন চশমা পরে, এত ছোটো বয়সে কীভাবে হলো, আরও কত কি!'

ক্যাপ্টেন সিয়াম হাত নেড়ে বলল–'এই তোরা কী শুরু করেছিস। আসতে না আসতেই ছেলেটার সাথে দুষ্টুমি শুরু করে দিয়েছিস। তোদেরকে পচা নাম দিতে নিষেধ করেছি না! অন্যজনকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা মোটেও উচিত নয়। এ রকম বাজে নামে যদি ওকে ডাকিস, তাহলে আমি গালিব স্যারের কাছে গিয়ে নালিশ করব।'

গালিব স্যার সাংঘাতিক কিসিমের মানুষ। একবার পেটাতে শুরু করলে আর রক্ষে নেই। অঙ্ক করান পিটিয়ে পিটিয়ে। গাধা-গরু পিটিয়ে নাকি তিনি মানুষ করেছেন। অঙ্কে ফেল করা ছাত্রদের কঠিন পানিশমেন্ট দেন। শামিম, সাকিব ও আনাস মুহূর্তেই চুপসে গেল। সিয়াম ক্লাস ক্যাপ্টেন, তার কথা স্যারেরা শোনেন। সে নালিশ করলে আর রক্ষে নেই। স্যার নির্ঘাত কঠিন পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করবেন।

ঘণ্টা বাজতেই সবাই চুপ হয়ে গেল। গালিব স্যার ইয়া বড়ো একটা বেত নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। শামিমের আত্মা শুকিয়ে গেল। যদি সাদ কোনো নালিশ করে, তাহলে আজ ওদের খবর হয়ে যাবে। এমনিতেই অঙ্কে কাঁচা বলে সে প্রায়ই স্যারের মার খায়। কী করবে, অঙ্ক মাথায় ঢুকতে চায় না। বানরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠানামা আর পিতা-পুত্রের বয়স বের করার অঙ্ক তার কাছে ভয়াবহ জটিল মনে হয়। নামে সরল, অঙ্ক যে কত গরল, তা করতে গেলে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়।

গালিব স্যার রোলকল করলেন। তারপর গোটা গোটা অক্ষরে একটা অঙ্ক বোর্ডে লিখে দ্রুত করতে বললেন।

একটি চৌবাচ্চা দুটি নল দ্বারা যথাক্রমে ২০ ও ৩০ মিনিটে পূর্ণ হয়। দুটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি কত সময়ে পূর্ণ হবে?

চৌবাচ্চার অঙ্ক। ঢোক গিলল শামিম। চৌবাচ্চা যখন খুশি ভর্তি হোক না। বাড়িতে তো মোটর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকি, এত সময়ের হিসাবের কী আছে? অসহ্য! শামিম কলম কামড়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। খালি খাতা দেখলে স্যার মারবেন। তাই লিখতে আরম্ভ করল।

হঠাৎ সাদ দাঁড়িয়ে বলল–'স্যার হয়েছে, ১২ মিনিটে ভর্তি হবে।'

স্যার চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করলেন–'এই ছেলেটা কে?'

সাদ কিছু বলার আগেই সিয়াম বলল–'স্যার, ও নতুন ভর্তি হয়েছে।'

স্যার মেঘস্বরে বললেন–'কী নাম তোর? এই অঙ্কটা এত দ্রুত কীভাবে করে ফেললি, শুনি?

সাদ স্মার্ট ভঙ্গিতে বলল–'স্যার এটা তো খুব সহজ। সময়ের গুণফলকে সময়ের যোগফল দ্বারা ভাগ করেছি।'

$$৩০\times২০/ (৩০+২০)$$

$$=৬০০/৫০$$

$$=১২ \text{ মিনিট}।$$

স্যার মাথা ঝাঁকালেন। তারপর সাদের পিঠে হাত রেখে বললেন–'বাহ! তোর ব্রেইন আছে দেখছি। বাকিগুলা তো সব গরু আর গাধা।'

স্যার আরও অঙ্ক করালেন। সাদ সবার আগে দাঁড়িয়ে যায় আর ক্লাসের বাকি সবাই হা হয়ে তাকিয়ে থাকে। সাদ তো দেখি অঙ্কে চ্যাম্পিয়ন। সিয়াম ভাবল–এ বছর মনে হয় আর ফার্স্ট হওয়া হলো না। এই ছেলে যে তুখোড়, ক্লাসের ক্যাপ্টেনশিপটাও বোধ হয় চলে যাবে।

ঢংঢং শব্দে স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল। আজকের ছুটির ঘণ্টা আনন্দের চেয়ে সিয়ামের কাছে কেন যেন বেদনার মনে হলো।

সবাই হুড়মুড় করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল। এখন গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড তাপদাহ, এর মধ্যে খেললে গা আরও ঘেমে ওঠে। স্কুলের মাঠের একপাশে কৃষ্ণচূড়ার সারি। লাল কৃষ্ণচূড়া ফুটে আছে।

বিকেলেও সূর্যের তেজ কমেনি। গাছে গাছে আম, জাম আর কাঁঠাল ধরেছে।

আনাস বাড়ি ফিরে কলতলায় ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করে নিল। তারপর আসরের নামাজ পড়ে ঘর থেকে দ্রুত বের হলো। শামিম, মুয়াজ, আল আমিন, ওমর, রাজু